মেধা ও সমাজ

কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। অত্যন্ত বিশিষ্ট সব ব্যক্তিরা আমার আগে এই বক্তৃতা দিয়েছেন। তাই সম্মানিত বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা কুণ্ঠাও হচ্ছে এই ভেবে যে আপনাদের প্রত্যাশা হয়তো ঠিকমতো মেটাতে পারব না। আমি আজ আপনাদের সামনে কোনো জ্ঞানগর্ভ গবেষণাপত্র নিয়ে আসিনি। প্রাক্তনীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, এই মনে করে কলেজের ইতিহাস আর বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থান নিয়ে কিছু তর্কের অবতারণা করতে চাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করার সুযোগ হয়নি। গত দশ-পনের দিনে হাতের কাছে যা পেয়েছি, তা থেকেই কিছু কথা আজ বলব। সেইসব তথ্য অসম্পূর্ণ তো বটেই, হয়তো কিছু ভুলভ্রান্তিও থাকতে পারে তাতে। সেজন্য আগেভাগে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই যে কথাটা সকলের মনে হয়, তা হল অতি উচ্চ মেধাসম্পন্ন একঝাঁক শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ তৈরি হওয়ার পর থেকে বাংলার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এমন তারকাসমষ্টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের বইতেই বলুন, আর স্মৃতিকথা কিংবা চায়ের আড্ডাতেই বলুন, সেইসব দিকপাল শিক্ষক-ছাত্রের নামই বারেবারে উঠে আসে। এই নিয়ে বিরূপ সমালোচনাও যে নেই, তা নয়। তা হল, এলিটিসম। প্রেসিডেন্সি কলেজ যে এলিট প্রতিষ্ঠান, তা প্রায় সকলেই মানেন। কিন্তু সেটা যে সমালোচনার কারণ হতে পারে, তা সকলে মানেন না। এই নিয়ে কিছু কথা আজ বলব। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে সাম্প্রতিক নানা বিতর্কের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং এলিটিজম নিয়ে আজকের আড্ডার শিরোনাম হতে পারে ‘মেধা ও সমাজ’।

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সিঃ বিশেষ না সাধারণ?

তর্কটা কিন্তু শুরু হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাবের সময় থেকেই। এই বিষয়ে ১৮৫৩-৫৪ সালে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের ওপরমহলের চিঠি চালাচালি থেকে দেখছি, হিন্দু কলেজ যে কেবল উচ্চশ্রেণির হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত, তা নিয়ে বেজায় অসন্তোষ।[1] কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি মোয়াট সাহেব ১৮৫৩ সালের অগাস্ট মাসে বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বীডনকে জানাচ্ছেন, একমাত্র কলকাতা শহরেই এমন দুটি

[1] *Papers relating to the establishment of the Presidency College of Bengal: Selections from the Records of the Bengal Government*, No. XIV (Calcutta: Bengal Military Orphan Press, 1854).

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ইংরেজি ভাষায় সাধারণ বিষয়সমূহের পড়াশোনা হয় কিন্তু যা বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। ১৭৮০ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাসায় কেবল মুসলিম ছাত্ররাই পড়ে। সেখানে ইসলাম ধর্ম ও আরবি-ফারসি ভাষায় নানা শাস্ত্র ও সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি একটি ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু সেই ইংরেজি বিভাগে পড়াশোনার হাল অতি শোচনীয়। অন্যদিকে হিন্দু ছাত্রদের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হিন্দু কলেজ এখন সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থসাহায্যে চলে। সেখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশোনা হয় না। সাধারণ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় লিবেরাল এডুকেশন দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টা দারুণভাবে সফল হয়েছে। হিন্দুধর্ম চর্চা ও সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আছে সংস্কৃত কলেজ।

কিন্তু সরকারি অর্থব্যয়ে হিন্দু কলেজকে কেবল হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইংরেজিতে সাধারণ বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অন্য যে তিনটি কলেজ হুগলি, কৃষ্ণনগর আর ঢাকায় খোলা হয়েছে, তা সব শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মেডিকাল কলেজেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পড়ার অধিকার আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সরকারি কলেজেও তাই। সুতরাং হিন্দু কলেজকে শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

আরও একটা প্রশ্ন উঠেছিল। হিন্দু কলেজে যে কেবল হিন্দু ছাত্ররাই পড়তে পারত, তাই নয়। তাদের মধ্যে আবার শুধু উঁচু জাতের তথাকথিত ভদ্রবংশের ছেলেদেরই নেওয়া হতো। রিপোর্টের ভাষায় তারা হল 'Hindoos of higher rank with a claim to respectability'। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই প্রথা চলে আসছিল। সরকারি অর্থসাহায্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজ পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা বাড়লেও আদি প্রতিষ্ঠাতাদের পাঁচজন পারিবারিক প্রতিনিধি তখনও কলেজের ট্রাস্টি হিসেবে নীতিনির্ধারণ করতে পারতেন। ছাত্রভর্তি নিয়ে একটি বিতর্কের কথা রিপোর্টে আছে। ১৮৫৩ সালে জেনেরাল মাতবর সিং-এর পুত্রকে নিয়মমতো সুপারিশপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করে কলেজে ভর্তি করা হয়। তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে কোনো ভারতীয় জেনেরাল ছিলেন না, তাই আন্দাজ করা চলে যে এই মাতবর সিং কোনো দেশীয় রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ হবেন। কিছুদিন পর অন্য ছাত্রদের অভিভাবকেরা আপত্তি তোলেন যে 'an improper class of society' থেকে কোনো ছাত্রকে কলেজে নেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধান করার পর সেই ছাত্রের ভর্তি নাকচ করে দেওয়া হয়।

কাউন্সিল অফ এডুকেশন থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হল, হিন্দু কলেজকে সব শ্রেণীর ছাত্রের জন্য খুলে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক তিরিশ হাজার টাকা খরচ করা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সামাজিক শ্রেণিবিভাগের প্রশ্নটা অবশ্য পুরোপুরি অবহেলা করা হল না। বেশ জটিল যুক্তির জাল বিস্তার করে কাউন্সিলের রিপোর্টে বলা হল, সমভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করা বাল্যকালেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যখন শিক্ষার্থীর মন অনেক নমনীয় আর স্পর্শকাতর থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তা শিক্ষার্থীকে আরও অনুসন্ধিৎসু আর সহনশীল হতে সাহায্য করে। তাই কাউন্সিলের প্রস্তাব, হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগকে একটি স্বতন্ত্র স্কুল হিসেবে স্থাপন করা হোক। সেখানে আগের মতো কেবল উচ্চশ্রেণির হিন্দু ছাত্ররাই পড়বে। তাহলে অভিভাবকদের আশঙ্কা খানিকটা প্রশমিত হবে। ইংল্যান্ডেও তেমন ব্যবস্থা চালু আছে – সেখানকার স্কুল অনেক 'এক্সক্লুসিভ', বিশেষ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত। সেই তুলনায় অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের কলেজে সমাজের নানা অংশের ছাত্রদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ হয়।

এর উত্তরে ১৮৫৩ সালের অক্টোবর মাসে সরকারের এডুকেশন সেক্রেটারি বীডন লিখলেন: 'The Council proposes to revolutionise the Hindoo College.' কিন্তু সেই কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করা উচিত নয় যাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠতে পারে। কেবল হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্মিত প্রতিষ্ঠানে নির্বিচারে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ভর্তি করা হচ্ছে, এই নিয়ে যাতে বিক্ষোভ সৃষ্টি না হয়, তার খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সুতরাং সরকারের মত, নেটিভ ম্যানেজারদের সঙ্গে সরকারের যে যৌথ পরিচালনার ব্যবস্থা এখন চালু আছে, তার সম্পূর্ণ অবসান হোক। প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হোক যা সব জাতি-ধর্মের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর পরিচালনার ভার পুরোটাই কাউন্সিল অফ এডুকেশনের হাতে ন্যস্ত হবে। হিন্দু কলেজ বলতে থাকবে তার জুনিয়র অর্থাৎ স্কুল বিভাগ আর সংস্কৃত কলেজ। সেখানে কেবল হিন্দু ছাত্ররাই পড়বে। তিরিশ হাজার টাকার তহবিল থেকে হিন্দু ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে – তাতে হয়তো বর্তমান ট্রাস্টিদের ক্ষোভ খানিকটা কমতে পারে। এই ব্যবস্থা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য না হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার তা অনুমোদন করতে রাজি আছে।

১৮৫৪ সালের মার্চ মাসে সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে। তা হবে 'open to all youths of every caste and creed'। তার জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করা

হবে। হিন্দু স্কুল আলাদা হয়ে যাবে। প্রথমে স্থির হয়েছিল, জেনেরাল ব্রাঞ্চ এবং মেডিকাল ব্রাঞ্চ, কলেজের এই দুটি শাখা থাকবে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে মেডিকাল কলেজ স্বতন্ত্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসে। গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগ এবং সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও ছিল, পরে সেগুলো তুলে দেওয়া হয়। সরকারি রিপোর্টেই বলা হয়, কলেজের পাঠক্রমে সাহিত্যের আধিক্য কমিয়ে মেন্টাল অ্যান্ড মরাল ফিলসফি, বিশেষত লজিক, অবশ্যপাঠ্য করা হবে। ন্যাচারাল ফিলসফি অর্থাৎ বিজ্ঞান, এবং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অর্থাৎ কেমিস্ট্রি, বটানি ও জিওলজিও অবশ্যপাঠ্য হবে। সেইসঙ্গে পলিটিকাল ইকনমিও পাঠক্রমে থাকবে।

হিন্দু কলেজে ছাত্রদের মাসিক ফি ছিল আট টাকা। তা কমিয়ে পাঁচ টাকা করা হল। বারোজন প্রফেসর এবং পাঁচজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদ অনুমোদিত হল। তাদের বেতন ধার্য হল, প্রফেসর পদে মাসিক ৬০০ টাকা, সেইসঙ্গে ১০০ টাকা বাড়িভাড়া, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে মাসিক ৩০০ টাকা আর ৮০ টাকা বাড়িভাড়া। মনে রাখা দরকার, সেসময় কলেজের প্রফেসরেরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ, সুতরাং তাদের বেতনও সেইভাবে স্থির হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, এর প্রায় একশো পনেরো বছর বাদে আমি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে অল্পদিনের জন্য পড়াতে আসি, তখন আমার বেতন ছিল মাসিক চারশো টাকা আর পঞ্চাশ টাকা বাড়িভাড়া। বলা বাহুল্য, ততদিনে আর সাহেব প্রফেসর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না।

নতুন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্সি কলেজ চালু হল ১৮৫৫ সালে। ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেখানে পড়ার সুযোগ বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্দেশ্য সেদিন ঘোষিত হয়েছিল, তা সাধিত হল কি? একশো বছর পর কলেজের শতবার্ষিকী পালনের সময় এই প্রতিষ্ঠানের একটি ইতিহাস প্রকাশিত হয়।[2] কলেজের তৎকালীন তিনজন বিখ্যাত অধ্যাপক – সুবোধ সেনগুপ্ত, সুশোভন সরকার এবং তারকনাথ সেন – সম্পাদিত সেই বড়সড় বইটাতে নানা তালিকায় বিন্যস্ত কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর নাম আছে। বাঙালি হিন্দুদের নামের ভেতর এমন বেশ কিছু পদবি আছে যা থেকে জাতি শনাক্ত করা খুবই সহজ, যদিও অনেক পদবি আবার বিভিন্ন জাতির মানুষ ব্যবহার করেন। কলেজের ইতিহাসের সেই বইতে যেসব ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা আছে, তাতে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, শতকরা অন্তত নব্বই ভাগ নাম উচ্চজাতির হিন্দু, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ। খুব একটা সতর্ক গণনার পর যে এই কথাটা

[2] *Presidency College Centenary Volume*, eds. Subodh Chandra Sengupta, Susobhan Chandra Sarkar and Tarak Nath Sen (Calcutta: Presidency College, 1955).

বলছি, এমন নয় – তেমনভাবে গোণার সময় পাইনি। কিন্তু মোটামুটি আন্দাজ হিসেবে এই সিদ্ধান্তটা ভুল বলে মনে হয় না। ১৯৫৫ সালে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ তালিকাও দেওয়া আছে – সেখানেও একই ছবি দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং ইতিহাসের দিকে তাকালে বলতে হয়, সব ধর্ম-শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কলেজকে উন্মুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি ১৮৫৪ সালে দেওয়া হয়েছিল, একশো বছর পরেও তা পালিত হয়নি।

আর একটু তলিয়ে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে যে এই সিদ্ধান্তটা অতিসরল। একশো বছর ধরে কলকাতা তথা বাংলার উচ্চশক্ষার সামাজিক ভিত এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি। সেই পরিবর্তনের দিকে চোখ ফেরালে প্রেসিডেন্সি কলেজের অবস্থানটা আরও স্পষ্ট হবে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ

হিন্দু কলেজ দিয়ে শুরু করি। নানা সূত্র থেকে আমরা জানি যে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা প্রধানত কলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ধনী বাঙালি হিন্দু পরিবার থেকে আসত। কলেজ স্থাপন করায় যাঁরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তখন কলকাতার নব্য অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট নেতা। ইংরেজ কোম্পানি এবং তার আধিকারিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবাদে তাঁরা ধনসম্পদ আর সামাজিক ক্ষমতা, দুটোই পেয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের ব্যবহারিক জগতের ভাষা ছিল ফার্সি। কিন্তু রাজভাষা হিসেবে ফার্সির যুগ তখন শেষ হয়ে এসেছে। তাঁদের পরিবারের ছেলেরা যাতে সুষ্ঠুভাবে ইংরেজ মাস্টারদের কাছে ইংরেজিতে শিক্ষা পায়, সেজন্যই তাঁরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়েছিলেন।

কিন্তু কলকাতার এই নব্য অভিজাত সমাজে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল না। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কলকাতার আদি ধনী পরিবার শেঠ-বসাকেরা জাতিতে ছিলেন তাঁতি, সুতানুটির বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসা তাঁদের ঐশ্বর্যের সূত্র। ছিলেন একাধিক সুবর্ণবণিক ও তিলি পরিবার যাঁরা কলকাতার অভিজাত সমাজের বিশিষ্ট সদস্য। আবার অনেকে ছিলেন যাঁরা ঐশ্বর্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে পারিবারিক জাতিপরিচয় ত্যাগ করে উচ্চতর জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে কলকাতার প্রথম সামাজিক ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে, নিখুঁত বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, কলিকাতা নগরী মুদ্রার জলে ভাসছে, তাতে প্রাণসঞ্চার করে চলেছে মুদ্রার স্রোত। তার স্পর্শ পেলে সামান্য ফেরিওয়ালা বা দোকানিও কিছুদিনের মধ্যে বিরাট ধনসম্পদ লাভ করে অভিজাতদের দলে ঢুকে পড়তে পারে, আবার মানী কিন্তু অভাবী লোক কলকাতায় এসে সামান্য কাজকর্ম করে দিন চালাতে পারে। সরকারি রিপোর্টে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে

অর্থে এক্সক্লুসিভ বলা হয়েছিল, তাতে 'higher class' কথাটা বারেবারে এসেছে হয়ত এই কথা বোঝানোর জন্য যে তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য যত না তাদের কাস্ট বা জাতিমর্যাদার জন্য, তার চেয়ে বেশি তাদের পারিবারিক ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের জন্য।

ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে বাঙালি সমাজে এই উচ্চগতির সুযোগ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এর নানা কারণ আছে যা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা অনেক আলোচনা করেছেন। এর পরিণামও বিভিন্ন। তার একটি হল উচ্চশিক্ষার সুযোগ হিন্দু উচ্চজাতির মধ্যে সীমিত হয়ে যাওয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলার সব জেলাতেই প্রধানত স্থানীয় জমিদারদের অর্থসাহায্যে হাই স্কুল এবং কলেজ তৈরি হতে থাকে। কিন্তু গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের সংখ্যাধিক্য বিপুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিচার করা প্রয়োজন।

শিক্ষার প্রসার, মেধার সংকীর্ণতা

হিন্দু কলেজের যুগে ইংরেজি শিক্ষার জগতে কলকাতার বনেদি পরিবারের যে আধিপত্য ছিল, কলকাতার বাইরে মফস্বলে উচ্চশিক্ষার প্রসারের ফলে তা নিশ্চিতভাবে কমে আসে। ১৮৭২ সালের এক সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ৪৪২ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ২১ জন এসেছে 'from the highest classes of society'। এই দিক দিয়ে কলেজকে সমাজের ব্যাপক অংশের জন্য খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল বলতে হয়।

কিন্তু অন্য এক দিক দিয়ে বাংলায় উচ্চশিক্ষার সামাজিক ভিত সংকুচিত হয়ে গেল। বেগবতী মুদ্রানদীর স্রোতে যে সামাজিক উত্থানপতন শুরু হয়েছিল, যার প্রভাবে কলকাতার নব্যধনাঢ্য সমাজের উদ্ভব, তা স্তিমিত হয়ে পড়ল। জমিদারি ব্যবস্থায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতি পঙ্গু হতে লাগল। এই অবস্থায় সামাজিক উন্নতির একমাত্র রাস্তা খোলা রইল ইংরেজি উচ্চশিক্ষার জোরে সরকারি চাকরি অথবা ওকালতি। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছোটবড় ভূসম্পত্তির মালিক উচ্চজাতির হিন্দুরা এই সুযোগ পুরোমাত্রায় নিতে পারল। জাতিব্যবস্থার কারণেই বইপড়া বিদ্যায় তাদের প্রথাগত অধিকার ছিল স্বীকৃত। সেটা এবার হয়ে গেল তাদের সামাজিক মূলধন। অন্যদিকে গ্রামসমাজের চিরাচরিত নিয়মে অন্যান্য জাতির উচ্চশিক্ষা পাওয়া কিংবা তথাকথিত ভদ্র জীবিকায় প্রবেশ করার পথে প্রচুর বাধা। সেসব পেরিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসার সুযোগ নবশাখ মধ্যজাতির ছাত্রদের মধ্যে খুব অল্পের ভাগ্যেই জুটত। বাংলার মুসলিম সমাজের অভিজাত শিক্ষিত পরিবারেরা অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতী

ছিল না। মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা পৌঁছেছে বিংশ শতাব্দীতে। তাই উনিশ শতকের শেষ দিকে, এমনকি বিশ শতকের গোড়াতেও, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের যে আধিক্য দেখা যাচ্ছে, তার বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে। কিন্তু সেদিক দিয়েও প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈশিষ্ট্য একটু বেশিরকম প্রকট।

কলেজের বিখ্যাত ছাত্রেরা অনেকেই তাঁদের স্মৃতিকথায় কলেজ-জীবনের নানা দিক নিয়ে লিখে গেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস লিখতে হলে এইসব বর্ণনা অত্যন্ত মূল্যবান হবে। কিন্তু আমি যে সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডির কথা বলছি, এই লেখকেরা প্রায় সকলেই তার অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের স্মৃতিতে কলেজের অধ্যাপক, সহপাঠী, পাঠক্রম, বিনোদন ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গই এসেছে, পছন্দ-অপছন্দের কথাও আছে। যথেষ্ট নস্টালজিয়া সত্ত্বেও সমালোচনার সুর যে একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু কলেজে শিক্ষক-ছাত্রের সামাজিক পরিধি যে ক্ষুদ্র এক গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ, তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তাঁদের মনে জেগেছিল, এমন কোনো নিদর্শন আমি পাইনি। সামাজিকতার এই সংকীর্ণতা তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন, মনে হয়।

এই গণ্ডির বাইরে থেকে যাঁরা কলেজ-জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রাজেন্দ্র প্রসাদ, স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।[3] ১৯০২ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে তিনি ছাপড়া জেলা স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন। নানা কারণে তাঁর কলকাতায় এসে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে যেদিন তিনি ভর্তি হতে এলেন, ততদিনে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখে তাঁকে ভর্তি করে নেওয়া হল। প্রথম দিন কেমিস্ট্রির ক্লাস, পড়াচ্ছেন ডক্টর পি সি রায়। ক্লাস ভর্তি, রোলকল চলছে। রাজেন্দ্র প্রসাদ একেবারে শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসলেন। এর আগে – তাঁর ভাষায় – 'ইতনে সির-খুলে বঙ্গালী লড়কে' একসঙ্গে তিনি কখনও দেখেননি। তখনও উত্তর ভারতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পুরুষমাত্রেরই মাথায় টুপি-পাগড়ি সমেত, নিদেনপক্ষে গামছা বেঁধে, প্রকাশ্যে বেরোনোর প্রথা জারি ছিল। কলকাতার বাঙালি ভদ্রলোক সমাজে যে ফ্যাশন বদলে গেছে, রাজেন্দ্র প্রসাদ তা আর জানবেন কী করে? তিনি কলেজে এসেছিলেন চাপকান, পাজামা আর টুপি পরে। ডক্টর রায়ের রোল কল শেষ হল। রাজেন্দ্র প্রসাদ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তাঁর রোল নম্বর তিনি জানেন না। ডক্টর রায় তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি এখনও মাদ্রাসা রেজিস্টারের রোল কল করিনি।' বলে অন্য একটি রেজিস্টার খুললেন। সেসময় কলকাতা মাদ্রাসার কিছু ছাত্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে বিজ্ঞানের ক্লাস করার

[3] *রাজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী*, প্রথম গ্রন্থ (পাটনাঃ সাহিত্য-সংসার, ১৯৬৭)

অনুমতি দেওয়া হতো। রাজেন্দ্র প্রসাদ বুঝলেন যে তার পোশাক দেখে ডক্টর রায় ধরে নিয়েছেন যে সে মুসলমান ছাত্র। রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন বললেন, আমি মাদ্রাসার ছাত্র নই, আজই আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছি কিন্তু এখনও রোল নম্বর জানতে পারিনি। ডক্টর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? নাম বলায় সারা ক্লাস পেছন ফিরে তাকে দেখতে লাগল কারণ সকলেই জানত ঐ নামে একজন বিহার থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। ডক্টর রায় তখন বললেন, চিন্তা কোরো না, তোমার নাম রেজিস্টারে উঠলে আমি আজকের ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক করে দেব।

রাজেন্দ্র প্রসাদ বলছেন, বাঙালি ছাত্রদের দেখে তিনি প্রথমে বেশ একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। তারা অনেকেই কোট-পাতলুন-হ্যাট পরে কলেজে আসত। তাঁর মতো গ্রাম্য হিন্দুস্তানির সঙ্গে বড় একটা মিশতে চাইত না। রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রথমে হাতেগোণা দু-চারজন হিন্দিভাষী ছাত্রের সঙ্গে ভাব জমালেন। তারা সবাই কলকাতার মাড়োয়ারি পরিবারের ছেলে। পরে অবশ্য অনেক বাঙালি ছাত্রের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়েছিল।

কলকাতা আর মফস্বল

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক বিভাজনরেখা আঁকা হতো অন্যভাবে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট সাংসদ হীরেন মুখোপাধ্যায় কলেজে ভর্তি হন ১৯২২ সালে। তিনি বলছেন, অনেক অভিজাত জমিদারবংশের ছেলেরা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত। তাদের কেউ কেউ নিজের গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসত।[4] প্রশাসক অশোক মিত্র বর্ণনা দিচ্ছেন : একদল ছাত্র ছিল যারা তাদের চালচলনে বুঝিয়ে দিত কলকাতা শহরটা তাদের সম্পত্তি। তারা এসেছে কলকাতার কয়েক ডজন নামকরা বংশ থেকে। দ্বিতীয় দল যারা স্কলারশিপ পেয়ে ঢুকেছে। তাদের মধ্যে ছিল উত্তম-মধ্যম দুটি দল। উত্তম যারা কলকাতার, মধ্যম যারা বাইরের। মধ্যমদের ছিল মেধার ছাপ, উত্তমদের শ্রেণীর ছাপ। আর সবশেষে ছিল মফস্বলের ছাত্ররা। 'ঘরের দেয়াল বা কোণ ঘেঁষে ইঁদুর যেমন নিঃশব্দে ঘুরঘুর করে, এরা কলেজে তেমনিভাবে চলাফেরা করত।'[5] কিন্তু কলেজের বাইরে ছিল হস্টেল। মফস্বলের ছাত্ররা থাকত সেখানে। সেখানকার সামাজিকতা ছিল অন্যরকম। সুবোধ সেনগুপ্ত বলছেন : 'তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সী কলেজের কমনরুমে সেইসব ছেলেরাই আড্ডা দিত, যাহারা ধনী, অভিজাত পরিবারের সন্তান অথবা তাহাদের অনুচর। কিন্তু হিন্দু হস্টেলের লাইব্রেরিতে, কমনরুমে,

---

[4] হীরেন মুখোপাধ্যায়, *তরী হতে তীর* (কলকাতাঃ মনীষা, ১৯৭৪)

[5] অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশ* (কলকাতাঃ দে'জ, ১৯৯০)

বারান্দায়, তাসের আড্ডায় যে সরস, সজীব, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা যে সকল বিতর্কে যোগ দিয়াছি তাহা স্মরণীয়।'[6] কলেজের কমনরুম আর হস্টেলের এই চারিত্রিক বৈপরীত্যের পেছনে রয়েছে সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ নাটক যার মঞ্চ ছিল প্রেসিডেন্সি সহ কলকাতার একাধিক কলেজ, হস্টেল আর মেসবাড়ি। সেদিকে একবার তাকানো যাক।

উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি চেষ্টায় কলেজ খোলা হতে লাগল বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার কলেজগুলোর গুরুত্ব কিছু কমল না। বিশেষ করে বিজ্ঞান পড়ার ব্যবস্থা অধিকাংশ জেলার কলেজে ছিল না। তাই প্রেসিডেন্সির পাশাপাশি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (পরে নাম বদলে হয় বিদ্যাসাগর কলেজ), রিপন কলেজ (পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), সিটি কলেজ আর স্কটিশ চার্চ কলেজে মফস্বলের ছাত্রেরা আসতে লাগল। বস্তুত এইসব কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রেসিডেন্সির তুলনায় বেশি ছিল। তার একটি কারণ ১৮৬৬ সাল থেকে প্রেসিডেন্সিতে মাসিক ফি দিতে হতো বারো টাকা, যেখানে অন্য কলেজে ফি ছিল সাধারণত পাঁচ-ছয় টাকা। দ্বিতীয় কারণ, অন্য কলেজে হস্টেলের সুবিধা তেমন একটা না থাকলেও বাইরের ছাত্রেরা মধ্য কলকাতার অসংখ্য মেসবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে পারত। প্রেসিডেন্সির নিয়ম ছিল, কলকাতায় নিজস্ব অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাসস্থান না থাকলে ইডেন হিন্দু হস্টেলে থেকে পড়তে হবে। মুসলিম ছাত্রদের জন্য ছিল বৈঠকখানা রোডে কারমাইকেল হস্টেল আর তালতলায় বেকার হস্টেল। স্বদেশি আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে কলকাতার মেসবাড়িগুলোতে রাজনৈতিক কর্মীদের, বিশেষ করে বিপ্লবী দলের সদস্যদের আনাগোনা বেড়ে যায়। এই কারণে প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের মেসবাড়ির ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা আরও জরুরি হয়ে ওঠে। হিন্দু হস্টেলে আড়াইশো আবাসিকের থাকার ব্যবস্থা ছিল। অন্য কোনো কলেজে তা ছিল না। কিন্তু এর ফলে মফস্বলের ছাত্রদের মধ্যেও একটা স্তরভেদ তৈরি হল। কিছু ছাত্র বেশি ফি দিয়ে অথবা স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু হস্টেলের খরচ মিটিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ত। বাকিরা কম ফি-তে মেসে থেকে বেসরকারি কলেজে পড়ত। এই প্রক্রিয়ায় এক-একটি জেলার সঙ্গে এক-একটি কলেজ এবং এক-একটি মেসবাড়ির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সূত্রে বছরের পর বছর সেই জেলার ছাত্রেরা কলকাতার কলেজে পড়তে আসত।

---

[6] সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *তে হি নো দিবসাঃ* (কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪)

বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার ছায়া ইডেন হিন্দু হস্টেলে এসে পড়ত। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের পারিবারিক সূত্র থেকে জানি যে তিনি যখন ১৮৮৯ সালে রাজশাহি থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন, তখন হিন্দু হস্টেলে তিনি একটি স্বতন্ত্র ঘরে একা থাকতেন এবং তাঁর একজন ব্যক্তিগত পরিচারক ছিল। জমিদার-সন্তান হিসেবে তাঁর ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও জাতিবিচার করা হতো। অর্থনীতির বিখ্যাত অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত হিন্দু হস্টেলে এলেন ১৯২৮ সালে। দু-তিনদিন বাদে খেয়াল করলেন, খাবার ঘরের দরজার চৌকাঠে লেখা 'ব্রাহ্মণদের জন্য'। তিনি লিখছেন, 'সন্ত্রস্ত হলাম – কত লোকের জাত মেরেছি। পরে জানলাম এসব নিয়ম এখন আর মানা হয় না। তবে সরকারি নিয়ম অনুসারে পূর্ত বিভাগ লেখাগুলিতে প্রত্যেক বছর নতুন করে রঙ লাগিয়ে দিয়ে যায়।'[7] কিন্তু একসময় যে নিয়ম মানা হতো, তা জেনেছি মেঘনাদ সাহার জীবনী থেকে। তিনি যখন ১৯১০ সালে হিন্দু হস্টেলে থাকতে এলেন, তখন জাতিবৈষম্যের কারণে তাঁকে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে বসতে দেওয়া হতো না, বারান্দায় আলাদা বসে খেতে হতো।

কলকাতা আর মফস্বলের মধ্যে সামাজিকতার পাঁচিল ভাঙ্গার ক্ষেত্রে উচ্চমেধার ভূমিকা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল অগ্রণী। প্রাক্তনীদের স্মৃতিকথায় দেখছি, জেলা শহর কিংবা গ্রামের স্কুল থেকে পড়তে আসা ছাত্র কলকাতার বৈভব, চাকচিক্য, ঠাটবাট দেখে প্রথমটায় বিস্মিত, খানিকটা ত্রস্ত। বিশেষ করে পুর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙাল ছাত্রদের বেলায় প্রাথমিক ধাক্কাটা ছিল প্রবল। ১৯২০-৩০-এর দশক পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চলতে হতো। মনে রাখতে হবে, তখনও পাঁচ-ছয়জন অধ্যাপক ছিলেন ইংরেজ। ছিলেন পার্সিভাল, কুরুভিলা জাকারিয়া কিংবা জাহাঙ্গির কোয়াজির মতো ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা শিক্ষক। অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে হলে বেয়ারারের হাতে স্লিপ দিতে হতো। অধ্যাপক তখন ঘরের বাইরে এসে ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতেন। অধ্যাপকদের কমনরুমে ঢুকে কথা বলার কোনো প্রশ্নই ছিল না। তাছাড়া শুধু ক্লাসেই নয়, ক্লাসের বাইরেও মাস্টারদের সঙ্গে কথা বলার ভাষা ছিল ইংরেজি। অধিকাংশ মফস্বলের ছাত্র ইংরেজি লেখা বা পড়ায় যথেষ্ট পারদর্শী হলেও কথ্য ইংরেজিতে তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না। সামাজিক পটুত্বের এই তারতম্য সুবোধ সেনগুপ্ত দেখেছিলেন ছাত্রদের কমনরুম আর হস্টেলের তফাতের মধ্যে।

---

[7] ভবতোষ দত্ত, *আট দশক* (কলকাতাঃ প্রতিক্ষণ, ১৯৮৮)

কিন্তু শহুরে কৌলীন্যের খামতি মেটানো যেত উচ্চমেধা দিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈশিষ্ট্য ছিল, সেখানে ম্যাট্রিকুলেশন অথবা আই-এ পরীক্ষার ফল দেখে ভর্তি করা হতো। সুতরাং সহপাঠীদের মধ্যে সামাজিক প্রভেদ যাই হোক না কেন, সকলেই জানত যে সর্বগ্রাহ্য মানদণ্ড অনুযায়ী তারা প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট মেধার প্রমাণ দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, সেই উৎকর্ষের মান কলকাতা তথা বাংলা তথা ভারতের অন্য সব কলেজের ছাত্রদের তুলনায় ওপরে। উচ্চমেধার সার্টিফিকেট থাকার ফলে প্রেসিডেন্সির নানা অপরিচিত এবং অস্বস্তিকর আদবকায়দা সত্ত্বেও মফস্বলের ছাত্রদের মনে একটা সমানাধিকার বোধ জন্মাত। সেই আত্মবিশ্বাস থেকে তারা কলেজ কমনরুমের আভিজাত্যের অহমিকা অগ্রাহ্য করে হস্টেলের বিদগ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিকতা নিয়ে বড়াই করতে পারত। এটা কম কথা নয়।

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেসময় ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের মেলামেশা করার সুযোগ বা উপলক্ষ কিছুটা কম ছিল, মনে হয়। চায়ের দোকান বা খাবারের দোকানে সময় কাটাতে হলে পয়সা খরচ করতে হতো। তাই প্রাক্তনীদের স্মৃতিকথায় ওয়াই-এম-সি-এ-র ক্যান্টিন ছাড়া আর কোনো জায়গার উল্লেখ দেখি না। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস তখন ছিল না, তা চালু হয় স্বাধীনতার পর ১৯৫০-এর দশকে। কলেজের বন্ধুত্ব তাই জমে উঠত এর-ওর বাড়ি গিয়ে। কিন্তু তা কেবল কলকাতাবাসী ছাত্রদের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং ক্লাসের বাইরে জোট বেঁধে কিছু করা বলতে দেখছি রবীন্দ্র পরিষদ, বঙ্কিম পরিষদ, কিছু কিছু বিভাগীয় সেমিনার, কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ আর বছরে একবার থিয়েটার করা। রবীন্দ্র পরিষদ নিঃসন্দেহে খুব আকর্ষণীয় ছিল। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবির। ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত বলছেন, গোড়ার দিকে রবীন্দ্র পরিষদের সভা বসত প্রতি রবিবার। সেখানে বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান হত। অধ্যাপকেরাও অনেকে আসতেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকবার কলেজে এসেছিলেন।[৪] থিয়েটারও নিশ্চয় বেশ উঁচুদরের হতো। ১৯৩০-এর দশকে অন্তত দুজন শক্তিশালী অভিনেতা প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন – রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং বিকাশ রায়। কিন্তু থিয়েটার নিয়ে হুজুগ ছিল ক্ষণস্থায়ী। তুলনায় হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের দলবদ্ধ পড়াশোনা, আড্ডা, খেলা, তর্ক, ঝগড়া, পেছনে লাগা – ছিল নিরন্তর, অবিচ্ছিন্ন। ফলে মফস্বলের ছাত্রদের কলেজ জীবনে পাতানো বন্ধুত্ব অনেক নিবিড় আর অন্তরঙ্গ হতো।

মেধাবী ছাত্রের তকমা থাকার ফলে মফস্বল থেকে আসা প্রেসিডেন্সির ছেলেদের যে সরকারি চাকরি পাওয়া কিংবা কলকাতার মান্যগণ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজতর হতো,

---

[৪] প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, *দিনগুলি মোর* (কলকাতাঃ আনন্দ, ১৯৮৫)

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখনকার দিনে কলেজের ডিগ্রি পাওয়ার পর সবচেয়ে লোভনীয় সম্ভাবনা ছিল আই-সি-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া। কিন্তু তা বছরে দু-একজনের ভাগ্যেই জুটত। তার পরে ছিল অডিট সার্ভিস আর বি-সি-এস, না হলে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা। বিকল্প হিসেবে অনেকেই ল কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি নিতেন। বিলেত গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি বা ব্যারিস্টারি পড়া যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য ছিল। অনেকেই তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষকতার কাজ নিতেন। এর জন্য যে সামাজিক মূলধন প্রয়োজন, তা নিশ্চয় প্রেসিডেন্সির ছাত্রজীবনে অর্জিত, যাতে উচ্চমেধার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

উচ্চশিক্ষা এবং সরকারি চাকরিতে উচ্চজাতির আধিপত্য কেবল বাংলায় নয়, ভারতের সব প্রদেশেই ছিল। ১৯২০-৩০-এর দশকে এই আধিপত্যের প্রতিবাদে ব্যাপক ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে। জাতীয় আন্দোলনে কৃষক সমাবেশের সূত্রে ভেল্লালা-কাম্মা-রেড্ডি অথবা মারাঠা-পাটিদার জাতি স্থানীয় এবং প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতাবান হয়ে সরকারি চাকরি আর উচ্চশিক্ষায় তাদের ভাগ দাবি করতে থাকে। সেইসঙ্গে দলিত ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির জন্য সংরক্ষণের দাবিও জোরদার হয়। বাংলায় এধরনের কোনো ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলন দেখা যায় নি। তার বদলে দেখা গেল ব্যাপক জমিদার-বিরোধী প্রজা আন্দোলন, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে। সে অঞ্চলে যেহেতু অধিকাংশ জমিদারি ছিল হিন্দুদের দখলে আর অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলিম কৃষক, তাই প্রজা আন্দোলনের ভিত প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষকের সামাজিক ঐক্যে। প্রধানত কৃষক-প্রজা পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, জমিতে কৃষকের স্বত্বের স্বীকৃতি আর কৃষিঋণ মকুব। কিন্তু অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে এসে পড়ল উচ্চশিক্ষা আর সরকারি চাকরিতে উচ্চবর্ণ হিন্দুর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলার প্রথম নির্বাচিত মন্ত্রিসভা। সরকারি চাকরি আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এল মুসলিম ও তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্সি কলেজেও তার প্রতিফলন দেখা গেল।

উনিশ শতকে কলেজের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে দু-একজন মুসলিম ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। যেমন সৈয়দ আমীর আলি, আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হুদা – তিনজনই আইনজ্ঞ ও বিচারক হিসেবে স্বনামধন্য হয়েছিলেন। বিশ শতকের গোড়ায় ছাত্র ছিলেন বরিশালের ফজলুল হক ও নদীয়ার আজিজুল হক, যাঁরা দুজনেই প্রজা আন্দোলনের নেতা ও প্রবক্তা। ফজলুল হক

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং আজিজুল হক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর হন। সুতরাং সংখ্যায় কম হলেও প্রেসিডেন্সির প্রথম যুগে কিছু উল্লেখযোগ্য মুসলিম ছাত্র ছিল। তবে লক্ষণীয় যে তাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের সন্তান।

এই ছবিটা বদলাতে শুরু করে ১৯২০-র দশক থেকে। পূর্ব আর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলিম কৃষক পরিবারের ছেলেরা অনেকেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসা শুরু করল। মধ্য কলকাতায় তাদের জন্য হস্টেল আর মেসও গজিয়ে উঠল। এই সময় থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্রদের তালিকায় অনেক মুসলিম নাম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইংরেজিতে হুমায়ুন কবির, ইতিহাসে একেএম মোহিউদ্দিন, গণিতে আনিরুল ইসলাম এবং কেমিস্ট্রিতে কুদরত-এ-খুদা। পরবর্তী কালে হুমায়ুন কবির শিক্ষা, প্রকাশন ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন। মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা প্রেসিডেন্সির কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক এবং ১৯৪৬ সালে কলেজের প্রিন্সিপাল হন। ১৯৪০-এর পর বেশ কয়েকজন মুসলিম অধ্যাপক কলেজে যোগ দেন, যেমন দর্শনে আবু সঈদ আইয়ুব, গণিতে আবদুল জব্বার ও হবিবুর রহমান, ইংরেজিতে আবদুল হাই ও ফজলুর রহমান, ইতিহাসে খলিলুর রহমান ও আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ। উল্লেখযোগ্য যে অল্প কয়জন উর্দুভাষী বাদ দিয়ে এঁদের প্রায় সকলেই বাংলার বিভিন্ন জেলার স্কুল থেকে পাস করা ছাত্র। ক্লাসের বাইরেও নানা ব্যাপারে মুসলিম ছাত্রদের নাম দেখতে পাচ্ছি এই সময়, যেমন বিভিন্ন বিভাগীয় সেমিনারে, রবীন্দ্র পরিষদে এবং ফুটবল টিমে। ১৯৩৬-৩৭-এ প্রেসিডেন্সি ফুটবল দলের দুজন খেলোয়াড় – আব্বাস মির্জা ও রশিদ আহমেদ – তখনকার লিগ চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিং-এর ইতিহাস-গড়া দলের খেলোয়াড় ছিল।

কোনো সন্দেহ নেই, অল্প কিছু দিনের মধ্যে যে এতজন মুসলিম শিক্ষক-ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের গৌরবোজ্জ্বল পরিসরে প্রবেশ করতে পারল, তার পেছনে রাজনৈতিক চেষ্টা ছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আমরা দেখেছি, সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ধাক্কাতেই নানা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কায়েমি দখলের অবসান হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে মেধার অবনতির প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। প্রেসিডেন্সির ঐ সময়ের কথা যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অনেকের বক্তব্যে দেখছি নির্বাচিত সরকারের রাজনৈতিক প্ররোচনা নিয়ে রীতিমতো উষ্মার ভাব। কিন্তু সত্যি কি মেধার অবনতি ঘটেছিল? মাত্র সাত-আট বছরের মধ্যে তা বোঝা গেল কী করে? নাকি পরিচিত সামাজিক বৃত্তে হঠাৎ কিছু অচেনা চরিত্রের অনুপ্রবেশে

কলেজের গণ্যমান্য অধিনায়কেরা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন? সেসময়কার ছাত্রদের মধ্যে কিন্তু দেখছি, হুমায়ুন কবির বা আবু সঈদ আইয়ুব বা কুদরত-এ-খুদা সম্পর্কে সপ্রশংস উচ্ছাস।

বরং মেধার প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যে বিরূপতা সহ্য করতে হতো, তার উদাহরণ আছে। কুদরত-এ-খুদা ১৯২৩ সালে কেমিস্ট্রি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে থাকা ছাত্রকে অনেক নম্বর গ্রেস দিয়ে ব্র্যাকেটে প্রথম করার চেষ্টা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিন বছর বাদে স্টেট স্কলারশিপে বিলেত যাওয়ার জন্য তিনি মনোনীত হলে আবার প্রশাসনের ভেতরে কোনো চক্রান্তে তা আটকে যায়। শেষ পর্যন্ত আবদুর রহিমের চেষ্টায় তিনি বৃত্তি নিয়ে লণ্ডন গিয়ে ডি-এসসি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দেশভাগের সময় কুদরত-এ-খুদা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর বাড়ি ছিল বীরভূমে, কিন্তু তখনকার সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় তিনি ঢাকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তাই নিয়ে আফসোস করতেন, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগে নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকলেও উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাবে তাঁর গবেষণার কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।[9]

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গনে হিন্দু-মুসলিম শিক্ষক-ছাত্রের সামাজিক বন্ধন কতটা মজবুত হতে পারত, তা পরখ করার সময় পাওয়া যায় নি। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলিম ছাত্ররা আর কলকাতায় পড়তে আসত না। পূর্ব পাকিস্তানে চাকরির সুযোগ বেশি হবে, এই আশায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারের অনেকেই ঢাকা চলে গেলেন। ১৯৫০-৬০-এর বছরগুলোতে প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম ছাত্র বা শিক্ষক আবার হাতেগোনা সংখ্যায় নেমে গেল।

স্বাধীনতার পর

স্বাধীনতা আর দেশভাগের পর প্রেসিডেন্সি কলেজে দুটি বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। প্রথম হল ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ছাত্রীদের আগমন। কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। এ দিক দিয়ে প্রেসিডেন্সি ছিল পশ্চিমবঙ্গে পথিকৃত। এর ফলে কলেজে সামাজিকতার পরিবেশ অনেক বদলে গেল। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় কফি হাউস আর একাধিক চা-জলখাবারের দোকানে ছাত্রছাত্রীদের একত্রে মেলামেশা করার সুযোগ হল। ১৯৫০-৬০-এর ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণে এ নিয়ে অনেক গল্প আছে। ছাত্রীদের মেধা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি কারণ

[9] শ্যামল চক্রবর্তী, *মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭)* (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২০০২)

ছাত্রদের মতো ছাত্রীদেরও একই পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি হতে হতো। তবে ছাত্রীদের জন্য যেহেতু কোনো হস্টেল ছিল না, তাই কলকাতার স্কুল থেকে পাস করা ছাত্রীরাই সাধারণত প্রেসিডেন্সিতে পড়তে পারত। সেদিক দিয়ে ছাত্রদের তুলনায় তাদের সামাজিক পরিধি বেশ খানিকটা সীমিত ছিল।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটা আমার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা আলোচনা দেখি নি। দেশভাগের পরবর্তী বছরগুলোয় পূর্ববঙ্গ থেকে একাদিক্রমে হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। তাদের একটা বড় অংশ কলকাতার শহরতলিতে উদ্বাস্তু কলোনি তৈরি করে বাস করতে শুরু করল। প্রধানত উচ্চজাতিভুক্ত হওয়ায় তারা স্বভাবতই মধ্যবিত্ত জীবিকার সন্ধানে উচ্চশিক্ষার ওপর জোর দিল। প্রত্যেক রেফিউজি কলোনিতে ছেলেদের আর মেয়েদের হাই স্কুল তৈরি হলো, অনেক কলোনিতে কলেজও হলো। বিশেষ করে লক্ষ্যণীয়, উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েদের বিপুল সংখ্যায় উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ। কিছুদিন পর থেকেই দেখা গেল, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে উদ্বাস্তু কলোনির ছাত্রছাত্রীরা কলকাতার অন্যান্য কলেজের পাশাপাশি প্রেসিডেন্সিতেও ভর্তি হচ্ছে। উত্তর বা দক্ষিণ শহরতলি থেকে ট্রেন বা বাসে চড়ে তারা কলেজে আসত।

এর ফলে যে জাতিগত দিক দিয়ে প্রেসিডেন্সির ছাত্রসমাজে বিরাট কোনো পরিবির্তন এল, তা নয়। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপার ঘটল। খাদ্যের অভাব বা চাকরির অভাব নিয়ে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি যতই উত্তপ্ত হতে লাগল, উদ্বাস্তু কলোনিগুলো হয়ে উঠল বিক্ষোভের প্রধান কেন্দ্রস্থল। সেই বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল বামপন্থী দলগুলো। ১৯৬০-এর বছরগুলোতে বৃহত্তর রাজনীতির ঢেউ প্রেসিডেন্সির প্রাঙ্গনে যেভাবে আছড়ে পড়তে লাগল, তা আগে কখনো ঘটেনি। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে বামপন্থী ছাত্রদের মিছিল-মিটিং প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। একাধিকবার সেখানে পুলিশের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, গুলি চলেছে। তার পরই এল হিন্দু হস্টেলে ছাত্রদের অনশন, কলেজ নির্বাচনে ছাত্র ফেডারেশনের জয়, দীর্ঘদিন প্রেসিডেন্সি কলেজ বন্ধ থাকা। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ির ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিসচেতন ছাত্রদের মধ্যে নকশালবাড়ি সমর্থকদের আলাদা সংগঠন গড়ে উঠল। তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল প্রেসিডেন্সির একাধিক ছাত্র। সেই ইতিহাস আজ সকলের জানা। আমি নিজে সেই সময় প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে যা জানি, তার থেকে আমার মনে হয়েছে, ষাটের দশকে কলেজের ছাত্র রাজনীতির এই পরিবর্তনের পেছনে উদ্বাস্তু কলোনি অধ্যুষিত অঞ্চলের ছাত্রদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। জানি না, আমার ধারণা সঠিক কি না।

সমাজপরিবর্তন ও মেধা

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে একশো বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাস মিনিট চল্লিশ-পঁতাল্লিশের মধ্যে বর্ণনা করলাম। স্বভাবতই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ পড়ে গেল। যেসব খ্যাতিমান অধ্যাপক-ছাত্রদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, তাঁদের কথা আর নতুন করে বললাম না। আমি শুধু দেখাতে চাইছিলাম, উচ্চমেধার যে সমাবেশ বছরের পর বছর দেখা যেত কলেজে, তার সামাজিক পরিধি খুব ছোট হলেও তাতে বৃহত্তর সমাজপরিবর্তনের ছাপ এসে পড়ত, যার ফলে ছাত্রসমাজের চরিত্র বরাবর এক থাকেনি। কিন্তু সেসব পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সির এলিটিস্ট প্রবণতা কি বদলেছিল?

একটা কথা স্পষ্ট করে দেওয়া ভালো। অনেক উচ্চমেধাসম্পন্ন মানুষ যদি একই প্রতিষ্ঠানে একত্রে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে পরস্পরের সংস্পর্শে তাদের কাজের উৎকর্ষ অনেক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কৃতী অধ্যাপকদের বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে দিলে সেইসব কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপকার হয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু মেধাবী গবেষকেরা একই প্রতিষ্ঠানে দৈনিক মেলামেশার ফলে উচ্চতর গবেষণা বা পঠনপাঠনের যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন, উৎকৃষ্ট জ্ঞানচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরম্পরা গড়ে তুলতে পারেন, সেই সম্ভাবনা তাহলে নষ্ট হয়। নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশেই নয়, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনেও বাছাবাছা বৈজ্ঞানিক-অধ্যাপক-ছাত্রদের জড়ো করে একাডেমি অফ সায়েন্স প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল।

এখানে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটা অন্যভাবে তোলা প্রয়োজন। প্রশ্নটা এই নয় যে, সেরা ছাত্রদের বাছাই করে একই কলেজে সেরা অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে কি না। প্রশ্নটা হলো, সেই ছাত্রদের বাছাই করা হচ্ছে কাদের মধ্যে থেকে? সেই ছাত্রগোষ্ঠীর সামাজিক পরিধি কতটা ব্যাপক? যারা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী, তারা কি তাদের মেধাপরীক্ষার যথাযথ সুযোগ পাচ্ছে? তাদের উচ্চশিক্ষার পথে যেসব সামাজিক বাধা আছে, তা অতিক্রম করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে কি?

এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রেসিডেন্সি কলেজের এলিট চরিত্রের সমালোচনা অযৌক্তিক নয়। তবে দোষটা কলেজ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপালে অন্যায় হবে। সমস্যাটা আধুনিক বঙ্গসমাজের আকৃতির ভেতরেই নিহিত ছিল। নির্মলকুমার বসু তাঁর *হিন্দু সমাজের গড়ন* বইতে দেখিয়েছিলেন, ১৯৩০-এর দশকে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জাতি বাংলার জনসংখ্যার দশ শতাংশের কম হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত জীবিকার সিংহভাগ দখল করে রেখেছিল। সেই উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর

একটা বড় অংশ আবার কলকাতা শহরের অধিবাসী। ১৯৩১-এর জনগণনায় দেখা গেছে, কলকাতা শহরে ব্রাহ্মণেরা জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ, কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজি-শিক্ষিতের হার ৩২ শতাংশ। সারা বাংলায় তখন ইংরেজি-জানা লোকের সংখ্যা এক শতাংশের কম। উচ্চশিক্ষায় এই অসাম্য প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে কমানো সম্ভব ছিল না।

স্বাধীনতার পর তফসিলি জাতি-জনজাতির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু হলেও প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সংরক্ষিত আসন খালি পড়ে থাকত আর তাতে সাধারণ ছাত্রদের ভর্তি করা হতো। এ নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয় ১৯৮৯-তে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বাকবিতণ্ডার পর থেকে। গত বিশ-ত্রিশ বছরে পশ্চিমবাংলার উচ্চশিক্ষার জগৎ অনেক পালটেছে। অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, সেখানে সমাজের ব্যাপক অংশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসছে। প্রেসিডেন্সি কলেজও আর কলেজ নেই, তা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেধা আর উৎকর্ষ নিয়ে অনেক সংশয়, উৎকণ্ঠা, এমনকি হতাশার কথা আজ শুনতে পাই। এই প্রসঙ্গে দু-একটি মন্তব্য করে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব।

প্রেসিডেন্সির স্বর্ণযুগের সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হলে দুটি বিরাট পরিবর্তনের দিকে নজর দিতে হয়। সেইযুগে মেধার একমাত্র মানদণ্ড ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন অথবা, স্বাধীনতার পর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা বোর্ডের স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেন্ডারি। সিনিয়র কেমব্রিজ কিংবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে আসা ছাত্র ছিল নগণ্য। সুতরাং জাতি-শ্রেণীগত সংকীর্ণতা সত্ত্বেও মেধা নির্ণয়ের মানদণ্ড নিয়ে কোনো বিবাদ ছিল না। অন্যভাবে দেখলে বলা চলে, এই সর্বসম্মত মানদণ্ড সামাজিক ক্ষমতা বা মর্যাদার ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটাত না। গত বিশ-ত্রিশ বছরে সেই সর্বসম্মত মানদণ্ড আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের, আরও বিশেষ করে কলকাতার স্কুলের একটা বড় অংশ আজ কেন্দ্রীয় বোর্ডের আওতায় চলে গেছে।

সেই সঙ্গে মিশে গেছে আর একটি সামাজিক বিভাজন। তা হল বাংলা আর ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের ভাগ। অন্তত চার-পাঁচ দশক ধরে এই বিভাজন একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সমাজে দুটি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে, যার ফলে এখন বাংলা-মাধ্যম স্কুল রাজ্য বোর্ড আর ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল সর্বভারতীয় বোর্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মেধা পরীক্ষার কোনো সর্বগ্রাহ্য মানদণ্ড আর নেই। এই দুই শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক পরিচয় নির্দেশ করা কঠিন নয়। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা যত প্রসারিত হয়ে ব্যাপকতর জাতি-শ্রেণীর

ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে, এলিট শ্রেণী ততই ইংরেজি-মাধ্যম সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ঝুঁকেছে।

শিক্ষাজগতে এই বিশাল পরিবর্তনের কবল থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না। আজকের ভারতবর্ষে এলিট কলেজ আর কলকাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় বোর্ডের সেরা ছাত্রছাত্রী যদি বিএ-বিএসসি পড়তে চায়, তবে তারা যায় দিল্লির কোনো কলেজে, অথবা সম্প্রতি স্থাপিত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে অনেকে স্কুল পাস করেই বিদেশে পাড়ি দেয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি আর ভাবাদর্শের দিকে তাকালে মনে হয়, এই প্রবণতা বাড়বে, কমবে না। ১৯৬০-এর দশকে আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, তখন হায়ার সেকেন্ডারির সেরা ছাত্রেরা প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স অনার্স পড়তে চাইত। তাদের অনেকেই আসত জেলার স্কুল থেকে। বাংলা-মাধ্যম স্কুলের ছাত্র প্রেসিডেন্সিতে পড়ে ইংরেজি সাহিত্যের নামজাদা অধ্যাপক হয়েছে, কলেজের ইতিহাসে এমন ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যাবে। প্রেসিডেন্সির প্রতিষ্ঠা দিবসে সেকথা মনে করলে আপনাদের মতো আমারও গর্ব হয়।

আজ হয়তো মনে হতে পারে, প্রেসিডেন্সি তার এলিটিস্ট তকমাটা ত্যাগ করতে পেরেছে। সবাই যে তাতে খুশি, এমন নয়। আজকের মতো দিনে আমরা প্রাক্তনীরা একত্র হয়ে যখন স্মৃতিরোমন্থন করি, তখন নস্টালজিয়ার সঙ্গে মিশে যায় বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের অসন্তোষ, কিছুটা অবজ্ঞা, হয়তো বা খানিক তাচ্ছিল্যের ভাব। কী ছিল আর কী হয়েছে, এই ভেবে আমরা হাহুতাশ করি। কিন্তু তার বদলে এমনও তো ভাবা যেতে পারে, হিন্দু কলেজে মাত্র ছ-জন কিংবা প্রেসিডেন্সি কলেজে বারো-জন শিক্ষক নিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণযুগে পৌঁছতে সময় লেগেছিল কয়েক দশক। তার পেছনে ছাত্র-অধ্যাপক-প্রশাসকের কত চিন্তা, কত শ্রম, কত অধ্যবসায় ছিল, তার হিসেব আমাদের জানা নেই। সেই ইতিহাস আজ অতীত। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি নবজীবন লাভ করেছে। শুরু হয়েছে নতুন এক যাত্রা যার ইতিহাস লেখা হবে অনেক দিন পর। সেই ভাবী ইতিহাস যে অতীতের পুনরাবৃত্তি হতে হবে, এমন দাবি নিশ্চয় আমরা করব না। সুতরাং আমি অন্তত আজ এই আশা প্রকাশ করতে চাই যে, মেধা আর সমাজের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক প্রেসিডেন্সি কলেজ সুষ্ঠু বা ন্যায্যভাবে রচনা করতে পারে নি, আগামী দিনে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় তা নতুন পথে সমাধা করার চেষ্টা করবে। সেই প্রত্যাশা জানিয়ে আমার আজকের বক্তব্য শেষ করছি।